জনকণ্ঠ

তারিখ 8 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৩

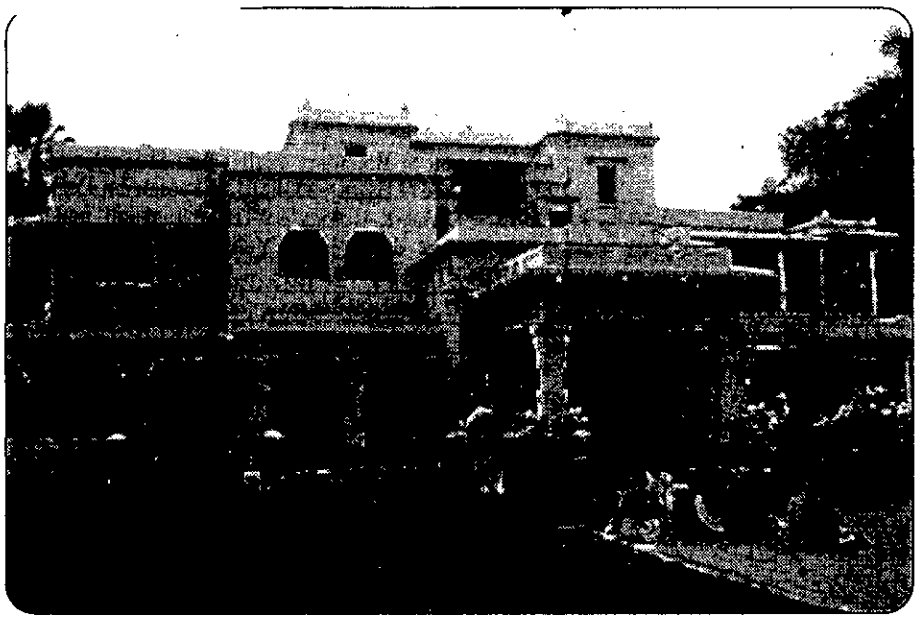

রবীন্দ্র ভাবনায় বিশ্ববিদ্যালয়

মিল্টন বিশ্বাস

ভারতীয় উপমহাদেশে বেসরকারী তথা নিজস্ব উদ্যোগে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপদান করার সব কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। যেহেতু তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। এ জন্য তার হাতে গড়া 'বিশ্বভারতী' সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ছিল অপরিসীম আস্থা। তবে একদিনে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠেনি, 'শান্তিনিকেতন' আশ্রম থেকে তার যাত্রা শুরু। কবি নিজে তাঁর জীবদ্দশায় 'বিশ্বভারতী'র আদর্শকে সমুন্নত রেখে এর পরিধিকে বৃদ্ধি করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেছেন। অর্থ সঙ্কট আর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন আদর্শের বিপরীতে কিংবা ব্রিটিশরাজের শিক্ষানীতির অন্যথা করে প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখতে অনেকটা সময় সাহিত্য সৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে হয়েছে কবিকে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম এবং স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রয়াসকে বুঝতে হলে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ভাবনাকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হবে। তবে কেবল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাবনা নয়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার সঙ্গে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কবির চিন্তাকে মূল্যায়ন করা দরকার। অন্যদিকে মুক্তবুদ্ধি চর্চার দিগন্তকে আরও বেশি উন্মুক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার গুরুত্ব উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রাধান্য নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক উপস্থাপন করা হচ্ছে। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতিচর্চা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ সামনে এসেছে। অর্থাৎ 'সহশিক্ষা কার্যক্রম নির্ভর' শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যাপকভাবে চালু হওয়া দরকার বলে মনে করছেন অনেকেই। আর বিচিত্র সব তর্ক-বিতর্কের মধ্যে একজন সংবেদনশীল কবি বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিষ্ঠান নিয়ে কি করেছিলেন, কি ভেবেছিলেন তার পর্যালোচনা গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও 'বিশ্বভারতী' থেকে ডিগ্রীধারীদের বর্তমান চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হচ্ছে অর্জিত আদর্শের সঙ্গে বাস্তব জীবনের ব্যাপক পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়েই। তবু সমাজের প্রচলিত মুখস্থ বিদ্যার বিপরীতে তাদের জীবনাদর্শ ও নৈতিক চেতনা ভিন্ন, যার নির্মাতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

॥ এক ॥

১৯০১ সালের ডিসেম্বরে (৭ পৌষ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) বোলপুরের নিকটে শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত বৃত্তিমুখী অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষার পরিবর্তে ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ মনোবিকাশের সুযোগদান। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের তপোবনকেন্দ্রিক বিদ্যানিকেতন থেকে এই বিদ্যালয়ের আদর্শটি গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন- 'আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো। শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতি সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অন্তশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র, স্থাপন করেছিলুম, 'শান্তিনিকেতন।' প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষার সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান ছিল শান্তিনিকেতনে। তিনি পল্লীর উদার প্রান্তরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন এভাবে- 'ভারত এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্থান শহরে নয় বলে। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। যেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার অবকাশ পেয়েছিল, সেখানে মানুষও ছিল ফাঁকাও ছিল। ঠেলাঠেলি ছিল না অথচ ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এ রকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।'

শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবীক্ষণের মূল কথা হলো ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। এই প্রক্রিয়াই মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো : জাতি ধর্ম নির্বিশেষ সকল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে লেখাপড়া ও এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা করে। আর উচ্চ চিন্তা এবং সরল জীবনযাপন শান্তিনিকেতনের শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করে। সেখানে শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতা শেখানো হয়। শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ পরিবেশে শিক্ষাদানের পরিবর্তে এখানে মুক্ত প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের থাকার জায়গা নিজের বাড়ির মতো। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঋতু উৎসব, খেলাধুলা, অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীত, সম্মিলন, ভ্রমণ, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে রবীন্দ্রনাথ নিজে এসব কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন, গান রচনা করতেন এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। সেখানকার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে শিক্ষাদান। প্রাচীন ভারতের তপোবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আশ্রমিক শিক্ষাদর্শের প্রতিফলন শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ আশ্রম চালুর শুরু থেকেই মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের পক্ষে কথা বলেন ও লিখিত নির্দেশ দেন। তাঁর মতে, যথার্থ শিক্ষা কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। উপরন্তু শিক্ষাক্রমে শিল্প কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিদ্যালয়ে নানারূপ কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, দারু শিল্প, মৃৎ শিল্প, চামড়া শিল্প, কৃষি শিল্প ও উদ্যান পরিচর্যার কাজে শিক্ষা দেয়া হয়। সেখানে সমাজসেবা ও পল্লী উন্নয়নের কাজ প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে শিক্ষার্থীরা।

মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও অন্যান্য ভাষা শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আরবী-ফারসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার কথা বলেছেন। বৃহত্তর প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য তিব্বতি এবং চীনা ভাষা শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন, সর্বোপরি ইংরেজী ভাষা আয়ত্তের কথাও। তিনি লিখেছেন- 'আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্য রসের চর্চা কেবল বাংলা সাহিত্যের মধ্যে পরিসমাপ্তি হবে? আমি কি বিশ্ব সংসারে জন্মাইনি? আমারই জন্য জগতে যত দার্শনিক, যত কবি, যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করেছেন। এর যথোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে।' (শিক্ষা) প্রকৃতপক্ষে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ঔপনিবেশিক শাসক-প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীত।

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন হিসেবে গড়ে ওঠা 'বিশ্বভারতী'তে গবেষক ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, উচ্চশিক্ষা এবং বিভিন্ন গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, প্রথম থেকেই এখানে মেয়েদের ভর্তি এবং নারী শিক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং এখনও সেই ঐতিহ্য বজায় রাখা হয়েছে

॥ দুই ॥

শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতার ধারায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার নতুন প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো 'বিশ্বভারতী।' প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে তিনি নির্মাণ করেন বিশ্বভারতীকে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দুটি প্রাঙ্গণে অবস্থিত- শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন।

'বিশ্বভারতী'র উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথের কথার সূত্র ধরে বলা যায়, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মানুষ কিভাবে পরস্পর সহযোগিতা করে বাঁচতে পারে এই প্রতিষ্ঠান সেই কাজে নিয়োজিত। বিশ্বভারতীর জন্য যে সংবিধান তৈরি করা হয়েছে- সেখানেই পাওয়া যায় রাবীন্দ্রিক বিশ্বাত্মবোধের পরিচয়- প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ই যার মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে পৃথিবীর সকল জ্ঞানের সমন্বয় ঘটবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এখানে এসে লেখাপড়া করবে- বিশ্বাত্মবোধে একাত্ম হয়ে সম্মিলনী সভ্যতার মহাঅক্ষরে তারা অবগাহন করবে। বিশ্বভারতীতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার চর্চা হয়। শিশুদের নার্সারি থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের নানাবিধ বিষয় পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। বিশ্বভারতীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম থেকেই বোঝা যাবে এ বিদ্যায়তনের জ্ঞানচর্চার বিশালতা- ক) শিশু ভবন (নার্সারি স্কুল), খ) পাঠভবন (মাধ্যমিক বিদ্যালয়), গ) শিক্ষা ভবন (উচ্চ মাধ্যমিক), ঘ) বিদ্যা ভবন (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর), ঙ) বিনয় ভবন (শিক্ষক-প্রশিক্ষণ), চ) কলাভবন- (শিক্ষা ও চারুকলা), ছ) সঙ্গীত ভবন- (সঙ্গীত ও নৃত্য), জ) শ্রীনিকেতন (পল্লী উন্নয়ন), ঝ) শিক্ষা মন্ত্র (গ্রাম- বিদ্যালয়), ঞ) শিক্ষা সদন (শিক্ষা শিক্ষণ), ট) চীনা ভবন- (চীনা, তিব্বতি ইত্যাদি ভাষা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান)। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী শিক্ষা দর্শন। ভারতের শিক্ষা ও কৃষির সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব। তিনি দেশীয় শিক্ষারীতিকে সমকালের উপযোগী করে নিয়েছেন। তেমনি নিজের ভাবনার কাছাকাছি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদদের ভাবনাকেও শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। 'যদিও তিনি শিক্ষাতাত্ত্বিক নন, তবু তাঁর চিন্তাধারায় মৌলিকতা রয়েছে।' (হুমায়ুন আজাদ, রবীন্দ্র প্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজ, পৃঃ-১৩৪)

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন হিসেবে গড়ে ওঠা 'বিশ্বভারতী'তে গবেষক ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, উচ্চশিক্ষা এবং বিভিন্ন গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, প্রথম থেকেই এখানে মেয়েদের ভর্তি এবং নারী শিক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং এখনও সেই ঐতিহ্য বজায় রাখা হয়েছে। 'বিশ্বভারতী' থেকে পিএইচডি করা জনৈক গবেষক ও সঙ্গীত শিল্পীর মতে, 'বিশ্বভারতীর আঙ্গিনায় এখনও সকাল ৭টা থেকে ক্লাস শুরু হয়, চলে ধাপে ধাপে দুপুর ১টা পর্যন্ত। এই পুরো সময়টা চারদিক থেকে ভেসে আসে গান। সেখানকার প্রকৃতি এবং পড়ালেখা, গান শেখা সব একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। গান শেখা বা তালিমের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে এমন পরিবেশ আর হয় না।'

॥ তিন ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তর্জাতিক চারিত্র্য তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ।... সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে।' তাঁর মতে, 'বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে সে সাধনা বিদ্যার সাধনা।' অর্থাৎ স্বদেশ-বিদেশের সকল পণ্ডিত অভ্যাগতের জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকে বিদ্যা সাধনার এই প্রতিষ্ঠানে। সেই লক্ষ্যে ১৯২১ সালে তিনি 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতা থেকে দূরে বোলপুরের সেই পরিবেশ ছিল নাগরিক জীবন থেকে ভিন্ন কিন্তু আঞ্চলিকতামুক্ত। এ জন্য ক্রমান্বয়ে দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে আসেন। বিশ্বভারতীর স্বনামধন্য প্রাক্তনীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, অস্কারবিজয়ী চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ। আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন ভাষা ও বিচিত্র জাতি এবং নানা বিষয় অধ্যয়ন এবং জ্ঞান জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য সেখানে স্থাপিত হয়েছে চীনা ভবন, হিন্দী ভবন, কৃষি অর্থনৈতিক গবেষণা কেন্দ্র, পল্লী শিক্ষা ভবন প্রভৃতি। বিদেশী একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সেখানে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। আত্মীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির উর্ধে বিশ্বভারতী 'সমস্ত দেশের একই চিত্ত তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলেছে।'

প্রকৃত পক্ষে ১৯১৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার চিন্তা বিকশিত হতে থাকে। শান্তিনিকেতনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্যার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য আসতে থাকলে কবি তাদের নিয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তিনি এ সময় এন্ড্রুজ ও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'শান্তিনিকেতনকে ভারতীয়দের শিক্ষাকেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে; এখানে ভারতের নানা প্রদেশের ছাত্র আসিবে এবং যথার্থ ভারতীয় শিক্ষা তাহারা গ্রহণ করিবে; বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্ররা নিজ নিজ আচার ব্যবহার নিজেরা পালন করিতে পারিবে, একত্র শিশুকাল হইতে বাস করিয়া ছাত্ররা একটি জাতীয় আদর্শ চর্চা করিতে সক্ষম হইবে।

চলবে...

লেখক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ এবং পরিচালক,
জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
writermiltonbiswas@gmail.com